গবেষণার সংক্ষিপ্তসার :

বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী 'বিদ্রোহী কবি' কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সবার প্রিয় নাম। তিনি দীর্ঘ প্রায় ৭৮ বছর জীবিত থাকলেও স্বাভাবিক চিত্তে সাহিত্য-সাধনা করতে পেরেছেন স্বল্পসময়। ১৯৪২ সালের পর নজরুলের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়। পক্ষাঘাতে কবি ইহ জনমের জন্য নীরব হয়ে যান। তাঁর অনেক সাহিত্য রচনার কোনো হদিস পাওয়া যায় না। যে সমস্ত সাহিত্য গুলি পাওয়া গিয়েছে সে সমস্ত সাহিত্যের গুণমানের জন্য তিনি আমাদের কাছে চির স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

নজরুল মূলত কবি। কিন্তু কবিতা বা গানের বাইরেও উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর কবিতা বা গান নিয়ে বড় বড় পন্ডিত ব্যক্তিগণ তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নজরুল যে একজন সার্থক গদ্যরচনাকার সে বিষয়ে তেমন ভাবে আলোচনা হয়নি বললেই চলে। সেই কারণে আমি নজরুলের গদ্যরচনা নিয়ে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছি। আমি গবেষণার শিরোনাম দিয়েছি 'গদ্য রচনাকার কাজী নজরুল ইসলাম'।

কুচবিহারের রাজা নরনারায়ণ ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রচিত একটি চিঠিই হচ্ছে বাংলাগদ্যের প্রাচীন দৃষ্টান্ত। পরবর্তীকালে ইংরেজ মিশনারীগণ গদ্যরচনার কাজে নিযুক্ত হন। তারপর রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পন্ডিতগণের হাতে বাংলাগদ্য পথের দিশা খুঁজে পায়। সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথ বাংলাগদ্যকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপদান করেন।

নজরুল বিংশ শতকের তৃতীয় দশকের দিকে বীরত্বপূর্ণ রুদ্রভাবের কবিতা দিয়ে বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্বের সূচনা করেন। কিন্তু কবি সত্তার বাইরেও তিনি যে একজন বিশিষ্ট গদ্যরচনাকার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

নজরুলের গদ্যরচনা গুলি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করতে গেলে তাঁর সমকালের সাহিত্য ও যুগমানসকে জানা প্রয়োজন। প্রথম অধ্যায়ে সে সব আলোচনা তুলে ধরা প্রয়োজন বলে মনে করি। সেই সঙ্গে নজরুলের সমকালের রাজনৈতিক বাতাবরণও আলোচনায় চলে আসে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী বিষম সংকটময়ের কাল। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস বড় কিছু লাভের আশায় ইংরেজদের পক্ষনিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবাসীর থলিতে কিছুই জুটল না। ভারতবাসীর ভাগ্যে জুটল অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যবৃদ্ধি এবং হতাশা। মানুষের মধ্যে সংশয়, অবিশ্বাস, স্বার্থপরতা বড় হয়ে দেখা দিল। ভারতবাসী আবার ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে নেমে পড়লেন। চালাক ইংরেজ 'মন্টেগু চেমসফোর্ড' শাসন সংস্কার নীতির ঘোষণা করলেন। জনগণ ইংরেজের চালাকি বুঝতে পারলেন। দেশবাসীর বিদ্রোহ আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইংরেজ সরকার

‘রাউলাট অ্যাক্ট’ এর দ্বারা দমন পীড়নের চরম রূপ প্রকাশ করলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকার জালিয়ানওয়ালাবাগে নির্বিচারে গুলি চালালেন। রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদ স্বরূপ ‘নাইট’ উপাধি ত্যাগ করলেন। এই সমস্ত আন্দোলন নজরুলের জীবনে প্রভাব ফেলেছিল।

সাহিত্যের জগতে রবীন্দ্র সমকালে দুই শ্রেণীর কবির দল দেখা যায়। একশ্রেণীর কবিরা ছিলেন নিছক রবীন্দ্রানুসারী। আর এক দল ছিলেন রবীন্দ্রবিরোধী। রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজের মধ্য থেকে তিনজন কবি ভিন্ন পথের দিকে যাত্রা করলেন। এঁরা তিনজন হলেন মোহিতলাল মজুমদার, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং কাজী নজরুল ইসলাম। মোহিতলাল হলেন দেহাত্মবাদী, যতীন্দ্রনাথ হলেন দুঃখবাদী। আর নজরুল সাধারণ মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা, অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে হলেন বিদ্রোহী।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে নজরুলের মানস গঠনের স্বাতন্ত্র্যকে তুলে ধরা হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব উল্কার গতি নিয়ে। বাংলা সাহিত্যে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। বিপুল উদ্যম, দুর্দম গতিবেগ যা এর আগে কোনো কবির রচনায় পাওয়া যায় নি। নজরুল যেমন সামাজিক অনাচার ও পীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন তেমনি বিদেশী ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ করেছিলেন। নজরুলের গদ্যরচনার মধ্যেও এই সমস্ত স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে নজরুলের উপন্যাসে নজরুলের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। তিনি মূলত তিনটি উপন্যাস রচনা করেন- ‘বাঁধনহারা’, ‘মৃত্যুক্ষুধা’, এবং ‘কুহেলিকা’। তাঁর উপন্যাসগুলিও রীতি আদর্শের দিক থেকে আলাদা মাত্রার উদাহরণ। ‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসটি একটি প্রকৃত পত্রোপন্যাস। ‘মৃত্যুক্ষুধা’ একটি সামাজিক উপন্যাস। অন্যদিকে ‘কুহেলিকা’কে রাজনৈতিক উপন্যাস বলা হলেও, পরবর্তীকালে জাহাঙ্গীরের ব্যক্তি সমস্যাই বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

‘বাঁধনহারা’ উপন্যাসে ১৭টি পত্রের মধ্যদিয়ে পাত্র-পাত্রীরা কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। কেন্দ্রীয় চরিত্র নূরুল, মাহবুবা ও শোফিয়ার সঙ্গে যে ত্রিকোণ প্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে, তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

‘মৃত্যুক্ষুধা’য় রয়েছে খ্রীষ্টান আর মুসলমানদের পাশাপাশি সহবস্থান। চাঁদ সড়ক এলাকায় বসবাস করেন তারা। প্রতিদিন তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে। আবার মিলন হতেও দেরি হয় না। উপন্যাসে বিশিষ্ট চরিত্র প্যাঁকালে এবং মেজবৌ। প্যাঁকালে কুর্শিকে বিয়ে করে খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। মেজবৌও খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে মিস জোন্সের প্ররোচনায়। পরে আনসারের চেষ্টায় মেজবৌ পুনরায় মুসলমান ধর্মে ফিরে আসে।

‘কুহেলিকা’ উপন্যাসে জাহাঙ্গীর জারজ সন্তান। সে বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা নিতে চান। কিন্তু জারজ সন্তান বলে অনেকের আপত্তি ছিল। বিপ্লবী প্রমত্তের ইচ্ছায় জাহাঙ্গীরের বিপ্লববাদে প্রবেশ। শেষ পর্যন্ত জাহাঙ্গীর, প্রমত্ত, বজ্রপাণীর বিচারে দীপান্তর হয়।

চতুর্থ অধ্যায়ে তুলে ধরেছি নজরুলের গল্প। তিনি তিনটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেন। ‘ব্যথার দান’, ‘রিক্তের বেদন’, ‘শিউলিমালা’। ‘ব্যথার দান’ গল্পগ্রন্থে মোট ছয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে। ‘রিক্তের বেদন’ গল্পগ্রন্থে মোট আটটি গল্প সংকলিত হয়েছে। অন্যদিকে ‘শিউলিমালা’ গল্প গ্রন্থে মোট চারটি গল্প সংকলিত হয়েছে। উপরি উক্ত গল্পগুলি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠে। যেমন প্রেমস্মৃতিমন্থন এবং বিরহ, যুদ্ধবর্ণনা এবং সমাজ।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত বিষয় নজরুলের প্রবন্ধ। তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি। যেমন- ‘যুগবাণী’, ‘রাজবন্দীর জবানবন্দী’, ‘দুর্দিনের যাত্রী’, ‘রুদ্রমঙ্গল’, ‘ধূমকেতু’। এই সমস্ত গদ্য প্রবন্ধ গুলি বিশ্লেষণ করে নজরুল সত্তার আলোচনা তুলে ধরা হয়।

নজরুলের প্রবন্ধগুলিতে মননশীলতার অভাব থাকলেও ভাষা পৌরুষের জন্য তাকে একজন স্বার্থক প্রাবন্ধিক বলতে অসুবিধা হয় না। প্রবন্ধগুলি আবেগের আতিশয্য, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও রূপকে ভারাক্রান্ত। আসলে সংবাদপত্রের প্রয়োজন মেটানোর জন্য লিখিত বলে প্রবন্ধ গুলি অযত্ন বিন্যস্ত। তবে প্রবন্ধগুলির ভাষার পৌরুষের জন্য বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমকে মনে করায়।

তাঁর ‘যুগবাণী’ প্রবন্ধগ্রন্থে মোট ২১টি প্রবন্ধ রয়েছে। যেমন- ‘নবযুগ’, ‘আবার তোরা মানুষ হ’, ‘ডায়ারের স্মৃতিস্তম্ভ’, ‘ধর্মঘট’, ‘লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে বেদনাতুর কলিকাতার দৃশ্য’, ‘বাঙলা সাহিত্যে মুসলমান’, ‘ছুঁৎমার্গ’, ‘উপেক্ষিত শক্তির উদ্বোধন’, ‘মুখবন্ধ’, ‘রোজ কেয়ামত বা প্রলয়দিন’,‘বাঙালির ব্যবসাদারী’ ‘আমাদের শক্তি স্থায়ী হয় না কেন ?’, ‘কালা আদমিকে গুলি মারা’, ‘শ্যাম রাখি না কুল রাখি’, ‘লাটপ্রেমিক আলি ইমান’, ‘ভাব ও কাজ’, ‘সত্যশিক্ষা’, ‘জাতীয় শিক্ষা’, ‘জাতিয় বিশ্ববিদ্যালয়’, ‘মুহাজিরিন হত্যার জন্য দায়ীকে ?’ এবং সর্বশেষে ‘জাগরণী’। ‘দুর্দিনের যাত্রী’ প্রবন্ধগ্রন্থে মোট সাতটি প্রবন্ধ রয়েছে। ‘রুদ্রমঙ্গলে’ রয়েছে মোট আটটি প্রবন্ধ।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে নজরুলের নাটক ও পত্রগুচ্ছ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। নজরুল মোট তিনটি নাটক রচনা করেন। যথা- ‘ঝিলিমিলি’, ‘আলেয়া’, এবং ‘মধুমালা’। ছোটদের একটি নাটক রয়েছে ‘পুতুলের বিয়ে’। নাটক গুলি কোন শ্রেণীর রচনা সেই সঙ্গে নাটকগুলির যথাযথ বিশ্লেষণ করে আলোচনায় রেখেছি। ‘ঝিলিমিলি’তে হাবিব এবং ফিরোজার প্রেমকে তুলে ধরা হয়েছে। নাটকটি রবীন্দ্রনাথের ‘ডাকঘর’এর সঙ্গে তুলনীয়।

‘আলেয়া’য় মীনকেতু আর জয়ন্তীর প্রণয় অতি সুন্দর ফুটে উঠেছে। মধুমালা মদনকুমারের প্রেমকে সার্থক করার জন্য আত্মত্যাগের পথ বেছে নেয়। সে প্রেমের বাধা হয়ে দাঁড়াতে চান না।

নাটক ছাড়াও রয়েছে নজরুলের কিছু পত্রগুচ্ছ। বিভিন্ন সময় নজরুল পত্ররচনা করেছেন, সেগুলি অত্যন্ত মূল্যবান।

নজরুলের গদ্য রচনা বিশেষ করে উপন্যাস , ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও নাটকে মুসলিম জনজীবনের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, উৎসব-অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন নজরুল। সপ্তম অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করেছি।

অষ্টম অধ্যায়ে নজরুলের গদ্যশৈলী নিয়ে আলোচনা করেছি। বাংলা সাহিত্যে নজরুলের গদ্য মৌলিকতার দাবী রাখে। তাঁর গদ্যরচনায় তৎসম, তদ্ভব এবং আরবি, ফারসি শব্দের ব্যবহার যেমন রয়েছে তেমনি বাক্যের ক্ষেত্রে নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছে। বাক্যকে তিনি কর্তা, কর্ম , ক্রিয়া অনুসারে না সাজিয়ে ক্রিয়াকে আগে এনেছেন, অথবা না বাচক বাক্য দিয়ে বাক্যের শুরু করেছেন। আবার আদর্শ বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি তাঁর আর এক অভিনব কাজ। এছাড়া যতিচিহ্নের ব্যবহারে নজরুল অত্যন্ত সচেতন।

উপরি উক্ত আলোচনার মাধ্যমে নজরুলকে একজন সার্থক গদ্যরচনাকার বলতে কোনো দ্বিধা নেই অর্থাৎ সার্থক গদ্য শিল্পী হিসাবে নজরুল বাংলা সাহিত্যে অনবদ্য।